ঝটিকা অভিযানে বিডিআর

প্রত্যক্ষদর্শীর ২৫ ঘন্টার বিবরণ

একটি অভিযান, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সব সময়ের মত পুলিশ নয়, বিডিআর একাই করেছে এই অভিযান। আশা ছিল অস্ত্র উদ্ধারের, সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের। দুটোর কোনোটিই হয়নি। অথচ সন্ত্রাসী ও অস্ত্র সবই ছিল হলের মধ্যে। যেখানে রেইড দিয়েছিল সেখানেই। তাদের চোখের সামনেই। কীভাবে অস্ত্রগুলো লুকানো হলো, ক্যাডাররাইবা কীভাবে বেঁচে গেল। কীভাবে একটি সফল প্রস্তুতির অভিযান ব্যর্থ হলো তার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লক্ষ্য করেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদক

বদরুদ্দোজা বাবু

১৪ ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে তখন ১৫ ফেব্রুয়ারি। রাত ১২.০৫ মিনিট। রাতের খাবারের সন্ধানে নীলক্ষেত মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। রাতের স্বাভাবিক ঢাকার চিত্র যেমন থাকে এ রাতেও তেমনি। এলোমেলো দু'একটি রিকশা চলছে। মাঝে মাঝে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলছে গাড়ি। হোটেলগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ব্যস্ত। ফুটপাতে ভাজা হচ্ছে পরোটা, ডিম। ডিম পরোটা খাবার সময় কানে এলো টেম্পোর বিকট আওয়াজ। এ সময় টেম্পোর এমন আওয়াজ পাওয়ার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে ১৫টির মতো টেম্পো। সবগুলো টেম্পোর পর্দা ঝোলানো। টেম্পোর গায়ে লেখা ঢাকা টু ক্যান্টনম্যান্ট। এতো রাতে ক্যান্টনম্যান্ট রুটের টেম্পোগুলো এদিক দিয়ে যাচ্ছে কোথায়? ব্যাপারটি রহস্যজনক। এগিয়ে গেলাম একটু সামনে। সোডিয়াম বাতির আলোতে বুঝতে পারলাম টেম্পোর ভেতরে বসে আছে বিডিআর-এর জওয়ানরা।

এতো রাতে কোথায় যাচ্ছে বিডিআর? আজ কি বিশ্ববিদ্যালয়ে তল্লাশি হবে? বিডিআর তল্লাশি করবে? কৌতূহল বাড়ল। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশের চেয়ে বিডিআরের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। আর একথা ওপেন সিক্রেট যে, পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের সখ্যের কারণে রেইড পড়ার আগেই খবর পৌঁছে যায় সন্ত্রাসীদের কাছে। ভাবলাম আজ যদি বিডিআর সত্যি বিশ্ববিদ্যালয়ে রেইড দিয়ে থাকে তাহলে অন্য আট-দশটি অভিযানের চেয়ে অবশ্যই অন্যরকম হবার কথা। কারণ তাদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনী নেই। তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে পড়লাম রিকশায়।

রাতের অন্ধকারে ঢেকে আছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। মল চত্বরে সুনসান নীরবতা। সূর্যসেন হল পেরিয়ে জসীম উদ্‌দীন হলের গেটের সামনে এসে রিকশা থামলো। চারপাশে থমথমে পরিবেশ। না, বিডিআর বাহিনীর আলামত পাওয়া গেল না। হলের গেট তালাবদ্ধ। গেটের পাশে পুলিশ ঘুমোচ্ছে। প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে নিয়ন্ত্রিত ক্যাডার বাহিনী রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু হল, জিয়া হল, সব হলেই একই অবস্থা। হাঁটতে হাঁটতে এলাম সূর্যসেন হলের গেটের সামনে। এখানেও আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

অগত্যা ভিসির বাংলোর সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। বিডিআর বাহিনী তাহলে গেল কোথায়– মনে মনে ভাবছি সেই কথা। ঘড়ির কাঁটা দুইটা বাজতে এখনো ২০ মিনিট বাকি। তাহলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ে রেইড দিতে বিডিআর টেম্পোতে করে যায়নি? হঠাৎ ট্রাকের হেড লাইটের আলোয় চোখ সরিয়ে নিলাম। নীলক্ষেত থেকে ছুটে আসছে। স্পষ্ট বোঝা গেল সাধারণ ট্রাক নয়। বিডিআর ভর্তি বিশাল ট্রাক লরী। এর পেছনে ছুটছে এয়ারপোর্ট রোডে চলা কয়েকটি ম্যাক্সি। সেগুলোতেও বিডিআর। বিশ্ববিদ্যালয়ে না ঢুকে চলে গেল সোজা রাস্তায়। গুলিস্তানের দিকে। সঙ্গে আসা দৈনিক আজকের কাগজ পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি কবির আহমেদ খান বললেন, 'চলেন হলে গিয়ে অপেক্ষা করি। রেইড দিলে তখন বের হওয়া যাবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে তখন দেখা যায় অস্ত্রের ঘাটতি হয়নি কখনো। আর এসব অস্ত্রের যোগানদাতা হলের নিয়ন্ত্রক ক্যাডার বাহিনী। অস্ত্রের মাধ্যমেই তারা নিয়ন্ত্রণে রাখে হলের আধিপত্য। প্রকাশ্যেই এই অস্ত্রের মহড়া চলে। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় ৩১ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার। ঐদিন দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ হামলা চালায় মুহসীন হলে। হলটি তখন পিন্টু সমর্থিত হল শাখার সভাপতি শিশির (ডগ শিশির) গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল। গুলি করতে করতে তারা হলে প্রবেশ করে। তাদের হাতে ছিল একটি নাইন এমএম পিস্তল, একটি পয়েন্ট টু টু রিভলবার, একটি পয়েন্ট থ্রি টু রিভলবারসহ ১২টি অস্ত্র। শিশির গ্রুপের ক্যাডাররা গুলির শব্দ শুনে ভিতর থেকে পাল্টা গুলি ছুড়ে। ৩০-৩৫ রাউন্ড গুলি বিনিময়ের পর আসাদ গ্রুপ হল দখল করে নেয়। এ সময় সাধারণ ছাত্ররা দিকবিদিক ছোটাছুটি করে তাদের জীবন রক্ষার জন্য। আধ ঘণ্টা পরে পুলিশ পৌঁছায় মুহসীন হলে। কিন্তু ক্যাডাররা মূল গেটটি তালাবদ্ধ করে রাখে। প্রক্টর, হলের প্রভোস্ট, পুলিশ বার বার হলের গেট খুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও ক্যাডাররা সেইদিকে কর্ণপাত না করে তাদের অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করে। পুলিশ রেইড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য এ জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় প্রায় তিনঘণ্টা। প্রক্টর, প্রভোস্ট, পুলিশ ক্যাডারদের বুঝিয়ে শুনিয়ে গেটের তালা খুলতে রাজি করায়। পরে বিডিআর পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে দুই ঘণ্টায় তল্লাশি চালায়। মাত্র ৬ রাউন্ড শটগানের গুলি উদ্ধার সম্ভব হয় তখন। কিন্তু সে সময় অস্ত্রগুলো হলের ভিতরেই ছিল। ক্যাডাররাই খুলে দিয়েছিল গেটের তালা। দখলকারী চিহ্নিত বহিরাগত সন্ত্রাসীরাও ছিল পুলিশের হাতের মুঠোয়। কিন্তু গ্রেপ্তার হয়নি তারা। গ্রেপ্তার হওয়া ১৩ জনের মধ্যে ১১ জনই ছিল সাধারণ ছাত্র কিংবা দেখা করতে আসা অতিথি। অতীতের হল তল্লাশির ফলাফলে দেখা যাবে, পুলিশ, বিডিআর, আর্মি যারাই রেইড দিক না কেন কয়েকটি পরিত্যক্ত অস্ত্র ছাড়া কখনোই বড় ধরনের সফলতা পায়নি। এখানে সহজেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এতো অস্ত্র যায় কোথায়? তল্লাশির সময় কীভাবে লুকানো হয় অস্ত্র?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধির কথামতো হলে রওনা দিলাম। যদি হলে বিডিআর রেইড দেয় তাহলে ভেতরে থেকে দেখা যাবে ক্যাডারদের কান্ডকারখানা। সঙ্গে বিডিআরের কার্যক্রম।

মুহসীন হলের গেটের সামনে দু'জন ছেলে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে কাঁচা বাজার। বাঁধন নামের একটি সংগঠনের সদস্য তারা। হলের ভেতরে বাঁধনের সকালের পিকনিকের প্রস্তুতি চলছে। বিভিন্ন হলের ছাত্ররাও এখন মুহসীন হলে আছে। এরা সবাই বাঁধনের সঙ্গে জড়িত। পুলিশকে গেট খুলতে বললেও তারা চুপচাপ বসে। এক পর্যায়ে চেঁচিয়ে তাদের একজন কনস্টেবল বলে উঠলো, 'আমগো কাছে হলের চাবি থাকে না। ঐ যে বসা দু'জনের কাছে চাবি।' গেটের পাশে টিভি রুম। বেশকিছু ছাত্র বসে উচ্চশব্দে সিনেমা দেখছে। অনেক ডাকাডাকির পর গেস্টরুমে বসা দু'জন ক্যাডারের একজন এগিয়ে এলো। বিরক্ত মুখে বললো, 'কি চাই'। পরিচয় দেবার পরে পকেট থেকে চাবি বের করলো সে। আমাদের একজনকে বললো, সামনের রাস্তাটি একটু দেখে আসতে। কেউ আছে কিনা। তাদের কথামতো গিয়ে দেখে এলাম। 'ঐ যে হোন্ডার শব্দ' বলে ক্যাডাররা একটু পিছিয়ে গেল। পাশ থেকে একজন জানালো, এটা হোন্ডার শব্দ নয়, পাশে ঘুমিয়ে থাকা পুলিশের নাক ডাকার শব্দ। আশ্বস্ত হয়ে গেটের তালা খুলে দিল।

গেস্টরুমের সোফার এক পাশে বসা একজন সাব-ইনসপেক্টর। নাম লেখা আইবুল। জানালো, কোতোয়ালি থানার। তিনি মনোযোগ দিয়ে দৈনিক পত্রিকা পড়ছেন। আর এক পাশে লম্বা হয়ে ঘুম দিয়েছে আরেকজন ক্যাডার। পায়ের পাশে কয়েল জ্বলছে। গেট খুলে দেয়া ক্যাডার এক পাশে এসে বসলো। কিছুটা বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

: সারা রাত জেগে হল পাহারা দিচ্ছেন খারাপ লাগে না...

: উপায় তো নেই। ১২ মাস পরে হলে

হঠাৎ খুলে গেল দরজা। দুই হাতে দুটি অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো এক যুবক। স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে গেলাম। ডান হাতে একটি নাইন এমএম পিস্তল, অন্য হাতে একটি থ্রি টু রাইফেল। কি করবে ছেলেটি?

ঢুকেছি। পাহারা দিয়ে না রাখলে তো যেকোনো সময় দখল হয়ে যেতে পারে।

: প্রতিদিনই কি আপনি পাহারা দেন?

: না, শিডিউল ভাগ করা আছে। একেকদিন একেকজন পাহারা দেয়।

: কোনো গ্রুপ যদি এসে এখন আক্রমণ করে...।

: এতো সহজ না। এই জন্যই তো গেট বন্ধ করে রাখি। ধরুন আপনাদের সঙ্গে কেউ এসে যদি আমাকে অস্ত্র ঠেকায় তখন উপায় থাকবে না। কিন্তু গেট বন্ধ অবস্থায় দখল করা সম্ভব না। আমাদেরও তো প্রস্তুতি আছে।

: অস্ত্র কোথায় রাখেন আপনারা?

: আছে জায়গামতো। সময়মতো বের হবে।

পাশে বসা এসআই আইবুল মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকান। মিটিমিটি হাসেন আমাদের দিকে তাকিয়ে।

ক্যাডাররা হলে পাহারা দিতে আসা পুলিশ বাহিনীর সামনে অস্ত্রের আনা- নেওয়া করে থাকে। পুলিশরাও জানে অস্ত্র কোথায় থাকে। কার কাছে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের কিছু বলার সাহস তাদের নেই! অবশ্য তাদেরকে সত্যিকার অর্থে কিছু করার ক্ষমতা কখনোই দেয়া হয় না বলে জানান একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা।

ক্যাডারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে টেলিভিশন রুমের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক এমন সময় দৌড়ে এলো এসআই আইবুল। 'চাবি দেন, চাবি দেন' বলে চিৎকার করছে। টিভিরুম থেকেও ছাত্ররা দৌড়ে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। বুঝতে বাকি রইলো না বিডিআর রেইড দিয়েছে। কলাপসিপল গেটে লাথি মারার শব্দ। জানালা দিয়ে উঁকি দিতে দেখা গেল কয়েকজন বিডিআর সদস্য মিলে তালা খোলার চেষ্টা করছে। সঙ্গে দাঁড়ানো ছিল একজন ক্যাডার। তার কাছেই হলের গেটের চাবি। সাব-ইন্সপেক্টরকে সে চাবি না দিয়ে দৌড় দিল তিনতলায়। এখানে দাঁড়ানো নিরাপদ নয় ভেবে দৌড়ে গেলাম সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে ৪০/৫০ জন ছেলে উঠছে। পিকনিকের প্রস্তুতি নেয়া বাঁধনের সদস্যরা, সাধারণ ছাত্র এমনকি ক্যাডাররাও আছে। চারপাশে চিৎকার-চেঁচামেচি। বিডিআর বিডিআর বলে চেঁচাচ্ছে কয়েকজন ক্যাডার। এদিকে মিনিটের মধ্যে বিডিআর বাহিনী গেটের তালা কেটে ফেললো। তারা সঙ্গে করে তালা কাটার যন্ত্র নিয়ে আসে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম চারতলায়। ভয়ার্ত ছাত্ররা চলে যাচ্ছে যার যার রুমে। এক এক করে বাতি জ্বালানো রুমগুলোর বাতি নিভে গেল। জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ছাত্ররা। অবশ্য কয়েকটি রুমে তখনও বাতি জ্বলছে। পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত কিছু ছাত্র। হয়তো তাদের শনিবার পরীক্ষা। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা খবর পায়নি তার হলে বিডিআরের রেইড পড়েছে।

চারতলার ডানদিকের করিডর। কোনার রুমটির আলো নিভানো। হঠাৎ খুলে গেল দরজা। দুই হাতে দুটি অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো এক যুবক। স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে গেলাম। ডান হাতে একটি নাইন এমএম পিস্তল, অন্য হাতে একটি থ্রি টু রাইফেল। কি করবে ছেলেটি? বিডিআরের সঙ্গে কি যুদ্ধ করবে? এই ছেলেটিকে কিছুক্ষণ আগেও গেটের পাশে দেখেছি। এমনকি আমাদের সঙ্গে কথাও বলেছে। বিডিআর দেখেই সে ছুটে এসেছে চারতলায়। করিডর দিয়ে সে এক দৌড়ে চলে গেল শেষ মাথায়। ওপাশ থেকে আরো কয়েকটি যুবকের ছোটাছুটি লক্ষ্য করলাম। দক্ষিণ ব্লকের ক্যাডারদের মধ্যে অস্ত্র লুকানোর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত এরা ছিল ঘুমিয়ে। কেউ একজন এসে খবর দিয়েছে হলে রেইড পড়েছে। তাই তাদের ব্যস্ততা। মুহসীন হলের পরিচিত ক্যাডার তারা। রুমে থাকা অস্ত্র এখন আর নিরাপদ নয়। নিরাপদ স্থানে লুকানোর চেষ্টায় তাদের এই ছোটাছুটি।

মুহসীন হলের এটি ফ্রন্ট ব্লক। চারতলা ও তিনতলা মিলিয়ে ফ্রন্ট ব্লকের কয়েকটি রুমে ক্যাডাররা থাকে। নেতারাও থাকে এই ব্লকে। হলের জানালা দিয়ে মুহসীন হলে ঢোকার পথটি দেখা যায়। তিনতলায়ও ক্যাডারদের ছোটাছুটি শুরু হয়েছে। অন্ধকারে তারা দৌড়াচ্ছে। করিডর দিয়ে নিচে তাকাতেই দেখা গেল একটি পরিত্যক্ত জায়গা। হেন জিনিস নেই সেখানে ফেলা হয় না, ছাত্ররা ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করে এই জায়গাটিকে। রেইডের সময় পলিথিন পেঁচিয়ে ক্যাডাররা এই জায়গায় অস্ত্র ফেলে রাখে। এখনও এই কাজটি করা হচ্ছে। চারতলার ক্যাডার ছাত্রটি একটি অস্ত্র ফেলে দিল এই পরিত্যক্ত জায়গায়। অস্ত্র ফেলে সে এগিয়ে এলো সিঁড়ির দিকে। মুহসীন হলে পুরনো দুটি লিফট রয়েছে। লিফট দুটি অচল মনে হলেও এটি এখনো সচল। রেইডের সময় এই লিফট দু'টি অস্ত্র রাখার জন্য নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত। রুমে অস্ত্র রাখলে দুইদিকেই বিপদ। রেইডের সময় রুমে অস্ত্র রাখলে অস্ত্র ও মানুষ দু'জনেরই ধরা পড়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। কারণ পুলিশ-বিডিআর তালাবদ্ধ ব্যাগ খুলতে বেশি আগ্রহী!

আচমকা গুলির শব্দ। এক রাউন্ড গুলি ফুটলো। চারতলার ফ্রন্ট ব্লক থেকে গুলির শব্দ পাওয়া গেল। করিডরের মধ্যে ছোটাছুটি আরো বেড়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে এখনো দুই তিন জন ছাত্র উপরে উঠছে। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত এরা সবাই টেলিভিশন রুমে ছিলো। করিডরের জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে দুইজন ক্যাডার।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার পায়ের শব্দ। করিডরে থাকা ছাত্র ও ক্যাডাররা মনে করছে নিচ থেকে হয়তো ছাত্ররা ওপরে উঠছে। ছাত্র নয়, বিডিআরের ছয়জন সদস্য দ্রুত গতিতে ছুটে এলো আমাদের দিকে। সবাই রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে। এক জনের হাতে রড। রড উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'এক পাও নড়বেন না। যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকুন।' সিঁড়ি বেয়ে তাদের আরো কয়েকজন ওপরে উঠে আসছে। চিৎকার করে তারা বলছে, 'এটা কত তলা। ওপরে কি আরো তলা আছে।' আমরা সাতজন করিডরে

অস্ত্র আছে, অস্ত্র নেই

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিডিআর একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায় পাঁচটি হলে। বঙ্গবন্ধু, সূর্যসেন, মুহসীন, জহুরুল হক, এস এম হলে চার শতাধিক বিডিআর এই অভিযান চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভিযানে তারা উদ্ধার করতে পারে একটি শটগান, দু'টি পিস্তল, ২০ রাউন্ড গুলি ও ১২টি ককটেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অস্ত্রের মধ্যে এই হিসাব খুবই সামান্য। সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলো হলে প্রচুর অস্ত্র আছে। জিয়া হলে রয়েছে স্টেনগান একটি, রাইফেল একটি, দু'টি বন্দুক, টু টু পিস্তল একটি এবং থ্রি টু রিভলবার একটি। বঙ্গবন্ধু হলে রয়েছে শট গান দু'টি (যার মধ্যে একটি উদ্ধার হয়েছে) রাইফেল দু'টি, তাউরাস একটি, টু টু পিস্তল একটি এবং নাইন এমএম রিভলবার দু'টি। সূর্যসেন হলে এখন রয়েছে কাটা রাইফেল তিনটি, তাউরাস একটি, টু টু পিস্তল একটি, থ্রি টু রিভলবার তিনটি এবং তিনটি বন্দুক। জহুরুল হক হলে রাইফেল তিনটি, বন্দুক একটি, শটগান একটি, থ্রি টু আরমানিস একটি, রাইফেল রেঞ্জের টু টু পিস্তল একটি ও একটি ইন্ডিয়ান বাইশ রয়েছে।

জসীম উদ্‌দীন ও জহুরুল হক হলের ক্যাডারদের মধ্যে অস্ত্রের দেয়া নেয়া হয়ে থাকে। এসএম হলে বন্দুক দু'টি, রাইফেল দু'টি, নাইন এমএম দু'টি, আটত্রিশ রিভলবার রয়েছে একটি। মুহসীন হলে দুইটি কাটা রাইফেল, দুইটি বন্দুক, একটি আরমানি টু টু, একটি নাইন এমএম পিস্তল, থ্রিটু রাইফেল একটি এবং একটি টু টু পিস্তল রয়েছে। অন্যান্য হলগুলোতেও কম বেশি অস্ত্রের খবর পাওয়া যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে যখন উত্তেজনা বিরাজ করে তখন অস্ত্রের যোগান আরো বেড়ে যায়।

দাঁড়িয়ে। একজন হাবিলদার আমাদের পাশে এসে বললো, 'এতো রাতে এখানে কি ? এই সবাইকে দড়ি দিয়ে বাঁধো'। ছাত্ররা ভয় পেয়ে গেল, একেকজন এতো রাতে কেন করিডরে সেই ব্যাখ্যা দিচ্ছে হাবিলদারকে। হাবিলদার কোনো কথাই শুনতে প্রস্তুত নয়। এমন সময় করিডরে এলো তাদের মুহসীন হল তল্লাশি অভিযানে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। না, বুকে নেম প্লেট নেই। সম্ভবত তিনি একজন ক্যাপ্টেন। গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'ডোন্ট ওরি। দাঁড়িয়ে থাকুন জায়গা মত'। একথা বলেই তিনি এগিয়ে গেলেন ৪৬৪ নম্বর রুমের দিকে। অন্ধকারে দাঁড়ানো পাশের ছেলেটিকে লক্ষ্য করলাম। এই তো সেই ছেলে। যে কিছুক্ষণ আগে অস্ত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে। তার কোমরে কি এখনো অস্ত্র আছে? ভয় পেয়ে একটু পাশে সরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'অস্ত্র কোমরে আছে?' আস্তে করে ক্যাডারটি বললো, 'না ফেলে দিয়েছি'। দাঁড়িয়ে থাকা এদের মধ্যে আরো দুই/তিনজন ক্যাডার রয়েছে। কিছুক্ষণ আগে তাদের করিডরে ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা গিয়েছে। এখন সবাই শান্ত ছেলের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের কাউকেই নড়তে দিচ্ছে না। চারপাশে চুপচাপ। রুম থেকে বের হয়ে কোনো ছাত্র করিডরে এলেই তাকে আমাদের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখছে বিডিআর বাহিনী।

বিশাল হাতুড়ি নিয়ে এলো একজন সৈনিক। ৪৬৪ নম্বর রুমের দিকে যাচ্ছে। ঐ রুমে থাকে আজকের কাগজের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি। বিডিআর রেইড দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও দৌড়ে চলে যায় তার রুমে। বার্তা সংস্থা ইউএনবি'র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদও তখন তার রুমে অবস্থান নেয়। এই রুমেই পাঁচ ছয়জন বিডিআর সদস্য তল্লাশি চালাচ্ছে। ক্যাপ্টনকে তারা যখন বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংবাদিক কার্ড দেখাতে চায় তখন তিনি বলে ওঠেন, 'ওসব আপনাদের পকেটে রাখেন।' লকার, ড্রয়ার সবই খুলে দেখছে তারা। চাবি নেই এমন একটি ব্যাগের তালা ভাঙা হচ্ছে। প্রায় আধঘন্টার মত তন্ন তন্ন করে খুঁজলো পুরো কক্ষ। না, কিছুই পাওয়া গেল না। আমরা তখনও করিডরে একইভাবে দাঁড়ানো। ৪৬৪ নম্বর রুম থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বিডিআর ক্যাপ্টেন আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়লো,

: কত নম্বর রুমে থাকেন?

১. ইলেকট্রিসিটি বক্সের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয় অস্ত্র।
২. মুহসীন হলের লিফ্ট দুটিও অস্ত্র রাখার নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত।
৩. দুই ভবনের মাঝের এই জায়গাটুকুতে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা হয় অস্ত্র।

: আমি এই হলের ছাত্র না।

: তাহলে এখানে কি করেন?

: আমি সাংবাদিক। রিপোর্টের কাজে এখানে এখন।

: কোথায় খবর পেলেন হলে রেইড হবে?

: একজন থেকে খবর পেয়েছি।

: কার কাছে থেকে?

: সেটা তো আপনাকে বলতে পারবো না।

ক্যাপ্টেন সাহেব হন হন করে চলে গেলেন। রেইড সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবো না।'

প্রায় দুই ঘন্টার মতো করিডরে দাঁড়িয়ে থাকার পর বিডিআর নিচে নামতে দিলো। সাংবাদিক পরিচয় আরো আগেই তাদের দিয়েছিলাম। তিনতলা, দোতলার করিডরে বিডিআর পাহারা দিচ্ছে। তিনতলার কয়েকটি কক্ষে তল্লাশি চালাচ্ছে বিডিআর। ঐ দিকে যেতে চাইলে বাধাপ্রাপ্ত হই। টেলিভিশন রুমে এখনো কয়েকজন ইংরেজি সিনেমা দেখছে। এদের বেশির ভাগই ক্যাডার। গেস্ট রুমে এই হলের পাহারারত পুলিশ বাহিনী দাঁড়িয়ে। দুইজন বিডিআর সদস্য তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। একজন কনস্টেবল জানালো, বিডিআর হলে ঢুকেই প্রথমে সাব-ইন্সপেক্টরকে শাসায়। হলের চাবি কেন তাদের কাছে নেই এই বলে। ঘুমিয়ে থাকা পুলিশদের চিৎকার করে ঘুম থেকে ওঠায়। তারপর তাদের সবাইকে গেস্টরুমে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে। পুলিশের চেহারার মধ্যেও ভয়। তাদের না জানিয়ে বিডিআর-এর এই অভিযানে তারা সবাই হতবাক।

এখনো পর্যন্ত কোনো অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব

হয়নি। টেলিভিশন রুমে একজন ক্যাডারের অস্ত্রের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'অস্ত্র বের করা এতো সহজ নয়।' অস্ত্র যে এই হলে আছে তা তিনি স্বীকার করলেন।

মুহসীন হলে কি কি অস্ত্র আছে তা জানার জন্য আলাপ হয় কয়েকজন নেতা ও ক্যাডারের সঙ্গে। তাদের থেকে পাওয়া তথ্য মতে জানা যায়, এই মুহূর্তে মুহসীন হলে দুইটি কাটা রাইফেল, দুইটি বন্দুক, একটি আরমানি টু টু, একটি নাইন এমএম পিস্তল, থ্রিটু রাইফেল একটি এবং একটি টু টু পিস্তল রয়েছে। গেটে পাহারারত ক্যাডাররা কাছে সাধারণত ভারী অস্ত্র রাখে না। তারা ছোট খাটো বন্দুক নিয়ে হল পাহারা দেয়। যদি কোনো গ্রুপ আক্রমণ করে বসে শুধু তখনই ভারী অস্ত্র নামানো হয়। তালাবদ্ধ করে ক্যাডাররা কখনোই অস্ত্র রাখে না। কারণ জরুরি প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি অস্ত্র বের করা সম্ভব হয় না। পুরনো জুতার ভিতরে কার্নিশে, খাটের নিচে লুকানো থাকে অস্ত্র। মুহসীন হলে রেইড দেওয়া বিডিআর শেষ পর্যন্ত কোনো অস্ত্রই পায়নি। সূত্র থেকে জানা যায়, ক্যাডাররা ঐ সময় অস্ত্রগুলো ফেলে রাখে কার্নিশে, ফ্রন্টব্লকের পরিত্যক্ত জায়গায়, এমনকি কারো কারো শরীরে ছিল। আমাদের সঙ্গে দাঁড়ানো ক্যাডারের শরীরেও একটি অস্ত্র ছিল বলে জানা যায়। বিডিআর শেষ পর্যন্ত তার শরীর চেক করেনি। কারোই শরীর চেক করা হয়নি।

বিডিআর-এর অভিযান শেষ হতে হতে ভোর রাত হয়ে গেল। বিভিন্ন কক্ষ থেকে বিডিআর সদস্যরা ছেলেদের নিচে নামিয়ে আনছে। ১৭ জনকে গেটের সামনে এক সঙ্গে দাঁড় করানো হয়েছে। এদের মধ্যে ৪৬৪ নম্বর রুমে থাকা দুইজন সাংবাদিকও আছে। কি কারণে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ প্রশ্ন করা হলে কমান্ডার বলেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর এখন আমি দেব না। যদি জানতে চান তাহলে হেড কোয়ার্টারে আসুন।' সবাইকে গাড়িতে নিয়ে যেতে বললো কমান্ডার। ছাত্ররা তাদের আইডি কার্ড বের করে বোঝানোর চেষ্টা করছে তারা নির্দোষ। কিন্তু তিনি কিছু দেখতে চাইছেন না। হল শাখার ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক গোলাম হাফিজ নাহিন একজনকে চিৎকার করে বলছে, 'হল প্রভোস্টকে ফোন কর। বল আমি কথা বলবো।' ফোন করতে তিনি যখন হল অফিসের দিকে যায় তখন ক্যাপ্টেন একজন সৈনিককে বলে ওঠেন, 'সবাইকে গাড়ি ওঠাও।' ইতিমধ্যে গাড়িতে ওঠানো হয় ১৭জনকে। একটি গাড়ি ও দুইটি টেম্পো করে আসা মোট ২৫জন বিডিআর সেই সময় ত্যাগ করে মুহসীন হল।

বিডিআর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হলের গেট লাগিয়ে দেয়া হয়। একজন চিৎকার করে বলে, 'অস্ত্রগুলো নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি'। প্রতিপক্ষ এই সুযোগে আক্রমণ করে বসতে পারে। ক্যাডাররা তাড়াতাড়ি লুকানো অস্ত্র আনতে ছুটে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ছাত্র। তাদের পাশের রুমের বন্ধুকে বিডিআর ধরে নিয়ে গিয়েছে। তারা বললো, 'যাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে, এদের বেশিরভাগই সাধারণ ছাত্র। কোনো কারণ ছাড়াই তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হলো'।

মুহসীন হলের গেটে ক্যাডাররা আবার তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার এখনও কাটেনি। অন্যান্য হলের অবস্থা জানতে বের হলাম। সূর্যসেন হলের সামনে বিডিআরের লরি। পাশে একটি পাজেরো লাইট জ্বালিয়ে। কাছাকাছি যেতেই দুইজন বিডিআর অফিসার এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'এত রাতে এখানে কি?' নিজের পরিচয় দিয়ে যখন রেইড-এর ব্যাপারে জানতে চাইলাম তখন তাদের একজন বললেন, 'এতো কথা বলতে পারবো না। জানতে হলে হেড কোয়ার্টারে আসেন'।

সূর্যসেন হল থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া ছাত্র ও ক্যাডারদের লরির ভেতরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অবাক হবার মতো বিষয় হচ্ছে এদের সবারই চোখ বাঁধা। গামছা, তোয়ালে, গেঞ্জি দিয়ে চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে। কর্তব্যরত একজন বিডিআরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'এ ব্যাপারে আপনার জানার দরকার নেই।' চোখ বাঁধা ছাত্ররা একেবারে চুপচাপ। তাদের পাশে কয়েকজন বিডিআর বসে। তাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই বন্দীদের ওপর। গাড়িগুলো মল চত্বর থেকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ছাত্র সূর্যসেন হলের গেট পেরিয়ে এলো। মার্কেটিং-এ পড়া হাসিবের বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে বিডিআর। সূর্যসেন হলের পুলিশও বিডিআরের ওপর বেশ ক্ষিপ্ত। কর্তব্যরত সাব ইন্সপেক্টর বলেন, 'আমরা কিছুই জানতাম না। তার ওপর আমাদের এসে চার্জ করছে কেন আমাদের কাছে হলের গেটের চাবি নেই। দুর্ব্যবহার তো করেছেই।' দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্ররা জানালো, বিডিআর রেইড দেওয়ার সময় ঘুমিয়ে থাকা ছাত্রদের রুমের দরজায় জোরে জোরে লাথি মারে এবং মারধর করার হুমকি দেয়।

সকালের দিকে হাজির হলাম পিলখানা বিডিআর গেটে। পাহারারত বিডিআর সদস্যের কাছে জানতে চাইলাম যাদের ধরে নিয়ে আসা হয়েছে তারা কোথায় আছে। সে কিছুই বলতে পারলো না। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বললাম, বড় কোনো অফিসারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে চাই। ফোনে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানানো হলো, অফিসাররা কেউ কিছু জানে না। আর এ ব্যাপারে কেউ কথা বলবে না। পুরো দিন বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা চলল। কিন্তু কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার দিকে শুধু এটুকু খবর পাওয়া গেল, তারা বিডিআর হেড কোয়ার্টারের ভেতরে আছে।

ঈদের আগে হলগুলোতে রেইড পড়বে এ কথা নেতা, ক্যাডাররা জানত। কিন্তু শুধু বিডিআর এই রকম একটি ঝটিকা অভিযান চালাবে এ কথা তারা ভাবতেও পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হল ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ছাত্রদলের

বিডিআর-এর অজ্ঞতা

বিডিআর-এর এই রকম একটি সফল প্রস্তুতি শেষ পর্যন্ত কেন ব্যর্থ হলো, এ প্রশ্ন সবারই। প্রথম কথা হচ্ছে বিডিআর সন্ত্রাসীদের চেহারা সম্পর্কে পরিচিত নয়। এবং তারা কোথায় থাকে সেটিও জানত না তারা। পুলিশই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানে। এক্ষেত্রে পুলিশকে জানালে অভিযানের খবর আগেই ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। সূত্র মতে জানা যায়, বিডিআর লালবাগে একজন সন্ত্রাসীর বাসায় যখন গিয়ে পৌঁছায় তখন ঐ সন্ত্রাসী বাসায় ছিল না। বের হয়ে আসার সময় বাড়ির ফোনটি বেজে ওঠে। ফোন ধরে বিডিআরের একজন সদস্য। ওপাশ থেকে বলে ওঠে, 'হ্যালো, বিডিআর অভিযানে নেমেছে। আপনি সরে পড়ুন।' 'আপনি কে বলছেন'? প্রশ্ন করে ঐ অফিসার। ওপাশ থেকে জানানো হয় তিনি লালবাগ থানার ডিউটি অফিসার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধরা ৮ জন ক্যাডারের মোবাইল থেকে ডিবি পুলিশ অফিসার কোহিনূরের মোবাইল নম্বর পাওয়া যায়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এই পুলিশকে নিয়ে কীভাবে সফল অভিযান সম্ভব। হ্যাঁ, এ কথা সত্যি পুলিশ চাইলে সব সন্ত্রাসীর খবর দিতে পারে।

হলগুলো সম্পর্কে বিডিআর-এর কোনো ধারণাই ছিল না। তারা কিছু নির্দিষ্ট রুমে অভিযান চালায়। এই রুমগুলোতে পূর্বের কোনো না কোনো অভিযানে অস্ত্র কিংবা সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে। আওয়ামী লীগের সময় ছাত্রলীগের ক্যাডাররা যে রুমে থাকত এখন ছাত্রদলের ক্যাডাররা সে রুমে থাকে না। ফলে এ অভিযানে ঐ রুমগুলো থেকে সাধারণ ছাত্র বেশি ধরা পড়েছে। এছাড়া ক্যাডাররা কোথায় কোথায় অস্ত্র লুকাতে পারে তাও জানত না বিডিআর। রুমের ভিতর অস্ত্র রাখার দিন চলে গিয়েছে। জানালার কার্নিশে, পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলে রাখা হয় অস্ত্র। কোন হল কোন গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে তাও জানত না বিডিআর। কিংবা ঐ হলে কোন কোন ক্যাডার আছে তার খবর ছিল না তাদের কাছে। আগে থেকে এ খবর নিলে অপরাধীদের ধরতে বেগ পাওয়ার কথা ছিল না।

অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে কয়েকটি হলের ক্যাডারদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি সূর্যসেন হল এবং জসীম উদ্‌দীন হলের ক্যাডারদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয় দুইজন। এই ঘটনার মাত্র দুইদিন আগে সূর্যসেন হলে গোয়েন্দা পুলিশের আকস্মিক তল্লাশিতে উদ্ধার হয় একটি অত্যাধুনিক বন্দুক, একটি পয়েন্ট থ্রি টু রিভলবার, দুটি চাপাতি এবং বন্দুকের গুলিভর্তি একটি ম্যাগজিন। এছাড়া সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। চিহ্নিত ২৩ জন সন্ত্রাসীর একজনও ধরা পড়েনি এখনো। প্রতিদিন গড়ে খুন হচ্ছে দুইজন। এসব ঘটনাই অভিযানের মূল কারণ।

সূত্র মতে জানা যায়, বিডিআর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে দুই তিন মাস আগে থেকেই এই অভিযানের প্রস্তুতি নেয়। সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রস্তুত থেকে শুরু করে তাদের নিজস্ব ইনফরমার দিয়ে ডিজিএফআই, এনএসআই ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সাহায্য করে। সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষে সৈনিকদের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়। উপযুক্ত সময় হিসেবে এই সময়টিকেই বাছাই করা হয় অভিযানের উদ্দেশ্যে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পুলিশকে না জানানোর। কারণ এতে আগেই খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

২০০০-এর পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এবং বিডিআর-এর সঙ্গে এই অভিযানের ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তারা সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকৃতি জানান।

রাতে অপারেশনে নামার আগে পুলিশ ও সিআইডির কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানো হয়। এমনকি উর্ধ্বতন কয়েকজন বাদে বিডিআরের অফিসাররা জানতেন না এই অভিযানের কথা। স্টেডিয়ামে লেজার লাইট শোতে যাবার কথা বলে বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে ভাড়া করা হয় অভিযানে যাবার গাড়ি। সন্ধ্যায় ফার্মগেট এলাকা থেকে বিভিন্ন রুটে চলা টেম্পো, ম্যাক্সি নিয়ে আসা হয় বিডিআর হেড কোয়ার্টারে। সন্ত্রাসীরা যাতে বুঝতে না পারে এ জন্য নেয়া হয় এই ব্যবস্থা। ঠিক দুইটার সময় সব চিহ্নিত স্পটে একযোগে অভিযান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রাত ১টা বাজতেই ডেমরা, গুলশান, বাড্ডা এলাকায় অভিযানে যাওয়া গ্রুপগুলো বের হয়ে পড়ে। যেসব গ্রুপ কাছেই অপারেশন করবে তারা বের হয় একটু পরে। এমন হিসাব করেই গ্রুপগুলো বের হয় যাতে তারা দুইটার দিকে স্পটে পৌঁছাতে পারে। রাত ১২টা থেকেই গ্রামীণ ও অ্যাকটেলের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক নিজস্ব ব্যবস্থায় বন্ধ করে দেয় বিডিআর। মোট ২১৫টি দলে বিভক্ত হয়ে নগরীর ২২টি থানার চিহ্নিত স্পটে ঠিক দুইটায় বিডিআর এই ঝটিকা অভিযান চালায়। হানা দেওয়া হয় সন্ত্রাসীদের বাসায়, আড্ডায়। নির্দেশ ছিল, চিহ্নিত স্পটে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই ধরে নিয়ে আসার। বিডিআর পুরো ঢাকায় তিন ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে ভোর পাঁচটায় ফিরে আসে হেড কোয়ার্টারে। এসবই ছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের সফল প্রস্তুতি।

ছাত্ররা ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করে এই জায়গাটিকে। রেইডের সময় পলিথিন পেঁচিয়ে ক্যাডাররা এই জায়গায় অস্ত্র ফেলে রাখে। এখনও এই কাজটি করা হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিডিআর কি সফল হয়েছে? দেখা যাক পরিসংখ্যান। ঝটিকা এই অভিযানে গ্রেপ্তার হয় ২৯১ জন। উদ্ধার হয় তিনটি পিস্তল, দুটি শটগান। গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেশি হলেও মহানগর পুলিশ জানায়, এদের মধ্যে ৪৮ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ রয়েছে। তবে এদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে গ্রেপ্তারকৃত ৮৫ জনের মধ্যে মাত্র আটজন পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। এই ছিল বিডিআর-এর অভিযান থেকে প্রাপ্তি। নিঃসন্দেহে এটি কোনো আশাব্যঞ্জক চিত্র নয়। ১৮ ঘণ্টা বন্দী হিসেবে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয় বাকি ৭৭ জনকে। কী ছিল তাদের এই ১৮ ঘণ্টার অভিজ্ঞতা? বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া এই রকম কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়। তাদের বর্ণনায় তুলে ধরা হলো এই ১৮ ঘণ্টার বিবরণ।

ভোর পাঁচটার মধ্যে মহানগরীর বিভিন্ন স্পট থেকে ২৯১ জনকে ধরে নিয়ে আসা হয় বিডিআর হেড কোয়ার্টারে। মুহসীন হলের গ্রেপ্তারকৃত ১৭ জনকে একটি ল্যান্ড ক্রুজার ও দুইটি টেম্পো নীলক্ষেত মোড়, নিউমার্কেটের দক্ষিণ গেট পেরিয়ে, বাংলাদেশ কুয়েক মৈত্রী হলের সামনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে ঢোকে পিলখানায় অবস্থিত বিডিআর হেডকোয়ার্টারে। সব গাড়িগুলো এক জায়গায় থামল। গাড়ি থেকে সবাইকে নামিয়ে একটি মাঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। কেন এভাবে দাঁড় করানো হলো তা বোঝা গেল কয়েক মিনিট পরে। বিডিআরের একজন জওয়ান হাতে অনেকগুলো কাপড় নিয়ে হাজির হলো। সামনে কয়েকজন সৈনিক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে। একে একে সবারই চোখ বাঁধা হচ্ছে। সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে তখনই ভয় ঢুকে যায়। তারা বুঝতে পারে না চোখ বেঁধে কি করা হবে? একজন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে বসলো, 'কি ব্যাপার ভাই। চোখ বাঁধছেন কেন?' আরেকজন ছাত্র বললো, 'ভাই চোখ বাঁধতাছেন গুলি করবেন না তো?' 'চুপ। কোন কথা বলবি না'— বলে একজন জওয়ান থামিয়ে দেয় সবাইকে। ময়লা, বিদঘুটে গন্ধযুক্ত কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা হয় সবার। চোখ বাঁধা অবস্থায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর তাদের নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসে। হাঁটতে শুরু করলো সবাই। তখন কেউই বুঝতে পারেনি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের। অজানা আশঙ্কা কাজ করছে সবার মধ্যেই। চোখ বাঁধা তার ওপর একজনের হাত সামনে ও পিছনের জনের কাঁধে, হোঁচট খাওয়াই স্বাভাবিক। এবং তাই হলো। তারপর সিঁড়ি পেরিয়ে মাটির একটি জায়গা। নির্দেশ দেওয়া হলো এখানেই পাছা লাগিয়ে বসে পড়ার। হঠাৎ আবার বলা হলো দাঁড়াতে। কথামত সবাই উঠে দাঁড়ালো। 'তুই এদিকে যা। তোরা এদিকে ওদিকে'— বলছে একজন জওয়ান। চোখ বাঁধা অবস্থায় কাকে

বলছে, কোনদিকে যেতে বলছে বুঝতে পারেনি গ্রেপ্তারকৃতরা।

বঙ্গবন্ধু হল থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বাংলা বিভাগের বায়োজিদ হোসেন লিপুকে। তিনি তার এই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'চোখ বাঁধা, একসঙ্গে দাঁড় করানো দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। গুলি করবে এমন আশঙ্কাও করেছিলাম। প্রথমে গিয়েই হলের বৈধ কার্ড দেখাতে চেয়েছি। কিন্তু তারা দেখেনি। চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, ক্লান্ত শরীরে বসে পড়েছিলাম ফ্লোরে। লাথি দিয়ে আবার দাঁড় করিয়েছে বিডিআর'।

নির্ঘুম সারা রাত তার ওপর চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে অনেকে ফ্লোরে পা বিছিয়ে বসে পড়ে। বিডিআর তাদের আবার দাঁড় করানোর জন্য পা দিয়ে ঠেলা মারে। কয়েকজন অভিযোগ করে, তাদের পাছায় লাথি মারা হয়। গালিগালাজ করার অভিযোগও ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে।

সকালের দিকে পরিচয়পর্বের পালা শুরু হলো। জিজ্ঞাসা করা হলো একেকজনের পরিচয়। তখনই চোখ বাঁধা ছাত্ররা জানতে পারলো তাদের সঙ্গে রাখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে ধরে নিয়ে আসা সবাইকে। এরই মধ্যে নির্দেশ, 'সবাই বামে ঘুরে দাঁড়া।' এক এক করে দুইজন জওয়ান দুই পাশে ধরে নিয়ে গেল পাশের রুমে। সেখানে নিয়ে হঠাৎ চোখের কাপড় খুলে ফেলা হলো। খুলেই চোখে টর্চের আলো। 'নাম কি' প্রশ্ন ছুঁড়লো অফিসার। কোথায় থাকে, কি করে সবই জিজ্ঞাসা করা হলো একে একে। সবাইকে এভাবে ডাকা হলো। এভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পরে চোখ বেঁধে আবার নিয়ে আসা হলো আগের

জায়গায়। পরবর্তী সময়টুকু কাটলো এই ঘরে।

দীর্ঘ তিন/চার ঘণ্টা চোখ বাঁধা। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল সবারই। চোখের বাঁধন একবারের জন্য খুলে দেওয়ার জন্য আকুতি-মিনতি জানাতে থাকে ছাত্ররা। একটু আলো দেখার জন্য কেউ কেউ কাপড়ের নিচ দিয়ে তাকাতে থাকে। হাতটাকে কোনোমতে চোখের কাছে নিয়ে চোখের বাঁধনটি হালকা করার চেষ্টা করে। এ কাজ করতে গিয়ে যারাই ধরা পড়ে তাদের বাঁধন বাঁধা হয় আরো শক্তভাবে। মুহসীন হল থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া আরবি বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র আজিজুর রহমান আজিজকে এ অপরাধে ওয়ারলেস সেট দিয়ে নাকে মারা হয়। নাক ফেটে তখন রক্তও বের হয়। তিনি সাপ্তাহিক

একে একে সবারই চোখ বাঁধা হচ্ছে। সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে তখনই ভয় ঢুকে যায়। তারা বুঝতে পারে না চোখ বেঁধে কি করা হবে?

২০০০কে বলেন, 'এক পর্যায়ে মনে হয়েছিল যেন চোখগুলো বের হয়ে আসবে। অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল। কয়েকবার অনুরোধ করেছি চোখের বাঁধন একটু হালকা করে দিতে। কিন্তু তারা শোনেনি। সহ্য করতে না পেরে যখন হাত দিয়ে একটু ফাঁক করার চেষ্টা করি একজন বিডিআর ছুটে এসে হাতের ওয়ারলেস সেট দিয়ে আঘাত করলো নাকে। নাকে হাত দিয়ে বুঝলাম রক্ত পড়ছে।'

বঙ্গবন্ধু হল থেকে ধরে নেওয়া ১০/১২ বছরের ক্যান্টিন বয় ইসমাইল পরিচিত ছিল না এ পরিবেশের সঙ্গে। হলের গোলাগুলিতে হয়ত সে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু যখন দেখলো অস্ত্র নিয়ে দৌড়ানো ঐ ক্যাডাররা পর্যন্ত এদের ভয় পাচ্ছে তখন তার ভয় আরো বেড়ে গেল। ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই সে কান্নাকাটি শুরু করে। চোখের বাঁধন খুলে দিতে বলে। বিডিআরের ধমকে চুপসে গিয়েছে বারবার।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল সবারই। কিন্তু কেউই মুখ ফুটে কিছু বলছিলো না। সকাল ৭টার দিকে পানি খেতে চাইলো একজন ছাত্র। পানি এলো আধ ঘণ্টা পর। বিশ্ববিদ্যালয় হল থেকে দুইজন অভিভাবককেও ধরা হয়। ৩০৭ নম্বর রুম থেকে ধরা হয় তাদের একজনকে। তিনি এসেছিলেন রোকেয়া হলে থাকা তার মেয়ের পরীক্ষার ফি দিতে। ঢাকায় কোনো আত্মীয় না থাকার কারণে থাকতে বাধ্য হন বঙ্গবন্ধু হলে থাকা ভাতিজার সঙ্গে। সন্ত্রাসী কিংবা অপরাধী নন– এ কথা বিডিআর ধরার পর থেকেই তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন। চোখ বাঁধতে বারণ করেন। দুঃখ করে বলেন, আর কখনোই আসবেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে। তারপরও হালকা করা হয়নি তার চোখের বাঁধন। এক পর্যায়ে তিনি ধরে রাখতে পারেননি চোখের পানি। ব্লাড প্রেসারের রোগী তিনি। এক সময় তার প্রেসার উঠে গিয়েছিল। জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনে একজন সাংবাদিক বিডিআরের একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'কি করবো। চুপ কইরা বইসা থাকতে বলেন'।

প্রায় ২০ মিনিট কাঁদার পর বঙ্গবন্ধু হলের লিপুর চোখের বাঁধন হালকা করে বিডিআর। টয়লেটে যাবার অনুরোধ জানানো হলে নিয়ে যাওয়া হয় ৪০/৫০ মিনিট পর। দুই জওয়ান দুই পাশে ধরে নিয়ে যায় টয়লেটে। টয়লেটে

নিয়ে যেতে হবে এই যন্ত্রণায় শেষে পানি খাওয়ানো বন্ধ করে দেয় বিডিআর।

জুমার নামাজ পড়তে চেয়েছে কয়েকজন। মুহসীন হল থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া দারোয়ান সুন্দর আলী আদায় করতে চান জুমার নামাজ। পড়তে দেয়া হয়নি তাকে নামাজ। নামাজ পড়তে দেয়া হবে কিনা একজন ছাত্রের এ প্রশ্নের উত্তরে একজন সিপাহী বলেন, 'আজকে সবার নামাজ পড়ার কথা খেয়াল হইছে। ইউনিভার্সিটিতে তো সব সময় ঘুইরা বেড়াও।'

সকালের নাস্তা দেওয়া হয় ১১টায়। একটি পরটার সঙ্গে একটু ডালভাজি। নাইলনের দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় খেতে দেয়া হয়েছিল। বিকাল চারটায় দেয়া হয় দুপুরের খাবার। পাঁচজন করে নিয়ে যাওয়া হয় খাবারের জন্য। যারা গরুর মাংস খায় না তাদের দেয়া হয় মাছ। খাবারের পর আবার তাদের হাত, চোখ বেঁধে রাখা হয়, অস্থির হয়ে পড়ে সবাই। জানতে চান, তাদের নিয়ে কি করা হবে? উত্তর মেলে না ওপাশ থেকে। এভাবেই সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে। হঠাৎ এসএম হলের এক ছাত্র চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'হয় গুলি করে মারেন, না হয় চোখের বাঁধন খুলে দেন'। হেসে ওঠে বিডিআর জওয়ানরা।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত ছাত্ররা আরো ভীত হয়ে পড়ে। দু'একজন জানতে চান, কেন ইলেকট্রিসিটি নেই। তখন বিডিআর-এর একজন বলে ওঠে, 'শালারা সব দেখতাছে। কেউ যদি চোখ খুলস তাহলে সিরিঞ্জ দিয়া চোখে এসিড ছিটামু'। সূর্যসেন হলের রাসেল হাতের বাঁধন খুলে ফেললে তাকে লাথি মারা হয়। মোটা রশি দিয়ে বেঁধে উপুড় করে ফেলে রাখা হয় মেঝেতে। এর পরই নাম ডেকে আলাদা করা হয় ছাত্রদলের আটজন ক্যাডারকে। অন্যান্যদের আলাদা একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। কাগজে বড় করে নাম লিখে, গলায় ঝুলিয়ে ছবি তোলা হয় সবার।

রাত ১০টার দিকে খবর এলো থানায় সবাইকে হ্যান্ডওভার করা হবে। প্রথমে আটজন ক্যাডারকে গাড়িতে তোলা হলো। এরপর বাকিদের। এক ঘণ্টার উপরে সবাইকে বসিয়ে রাখা হলো গাড়িতে। রাত সাড়ে ১২টায় দিকে ভ্যানগুলো তিন নম্বর গেট দিয়ে বের হয়ে ছুটলো রমনা থানার দিকে। নির্দোষ, সন্দেহভাজন এবং চিহ্নিত সন্ত্রাসী এই তিনভাগে ভাগ করে পুলিশকে একটি তালিকা দেয় বিডিআর। সে অনুযায়ী পুলিশ ব্যবস্থা নেয় রমনা থানার ডিউটি অফিসারের সামনে সবাইকে নেওয়া হলো। রাত ১টার দিকে মুক্তি পায় ৭৭ জন নিরীহ মানুষ।

কিন্তু মুক্তি পায়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা সন্ত্রাসের হাত থেকে। তারা এখনও সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি। নিত্যদিনের জীবনে এই নিরীহ ছাত্ররা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ক্যাডারদের সঙ্গে সহবাসে। অস্ত্রে গুলির শব্দে তাদের পড়াশোনা, আড্ডা এখন ব্যহত হয় না। এই অসুস্থ জীবনকে স্বাভাবিক জীবনের চিত্র মনে করেই তাদেরকে বছরের পর বছর পার করতে হয়। সরকারের বদল হয়। অঙ্গীকারে পর অঙ্গীকারের জন্ম হয়। কিন্তু মৃত্যু হয় না সন্ত্রাসের। শুধু লোক দেখানো অভিযান। পুলিশের অভিযান মানেই এখন সাজানো নাটক। এমন সময় ঝটিকা অভিযানে বিডিআর'কে দেখে যে আশা দেখেছিল নিরীহ ছাত্রটি, মাত্র কয়েকটি ভুলের জন্য তাকে আবারো আশাহত হতে হলো। এখন এই নিরীহ ছাত্রটি কী আর আশা করবে না? দেখবে না অস্ত্রমুক্ত ক্যাম্পাসের স্বপ্ন? কে তার, তাদের আশা পূরণ করবে, করবে স্বপ্নের বাস্তবায়ন?

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

আরেকটি অভিযান দেখার আশায়

১৯ ফেব্রুয়ারি। রাত ৯টা বাজে তখন। পুলিশের একটি সূত্রের ফোন এলো। জানালো হলগুলোতে আজকেও সেদিনের মত বিডিআর রেইড দেবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতি নিলাম স্পটে যাবার। হঠাৎ-ই মনে হলো এর আগের অভিযানে নিরীহ ১৪ জনের কথা। ১৮ ঘণ্টা চোখ বেঁধে রাখার অসম্ভব যন্ত্রণার কথা মনে হতেই দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। ভাবলাম এবার যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায়। পরে নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম।

রাত ১২.০০। মল চত্বরের আশপাশে কেউ নেই। কলাভবনের গেটের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে কয়েকজন যুবক। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকি রইলো না এরা হলের ক্যাডার। রাতের নীরবতা কাঁপিয়ে উচ্চস্বরে গান গাইতে গাইতে ক্যাডাররা ঢুকলো জসীম উদ্‌দীন হলে। গেটে পাহারারত পুলিশ জানালো এরা জসীম উদ্‌দীন হলের ক্যাডার। ১৫ তারিখের হল তল্লাশির সময় ছিলাম মুহসীন হলে। সূর্যসেন হলেও অস্ত্রের কমতি নেই। সূত্র মতে জানা যায়, সূর্যসেন হলে এখন রয়েছে কাটা রাইফেল তিনটি, তাউরাস একটি, টু টু পিস্তল একটি, থ্রি টু রিভলবার তিনটি এবং তিনটি বন্দুক। মাঝে মাঝে এর চেয়েও বেশি অস্ত্র থাকে সূর্যসেন হলে।

সূর্যসেন হলের গেট তালাবদ্ধ। ছোটখাটো একজন ক্যাডার গেটের ভেতর হাঁটাহাঁটি করছে। ডাকলাম তাকে। পরিচয় দিয়ে খুলতে বললাম গেটের তালা। তার কাছে চাবি থাকলেও তার ক্ষমতা নেই গেটের তালা খোলার। খবর দিল আরেকজন নেতাকে। তিনি এসে খুললেন তালা। সূর্যসেন হল একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। বিডিআরের তল্লাশির পর আতঙ্কে হল ছেড়েছে সাধারণ ছাত্ররা। ধরে নিয়ে যাওয়া ছাত্রদের মুখে শুনছে ঐদিনের অভিজ্ঞতা। সামনে ঈদ। ঈদে ধরা পড়লে বাড়িতে যাওয়া হবে না এই ভয়ও কাজ করেছে তাদের মধ্যে। গেটের ভেতরে বসা কয়েকজন ক্যাডার জানতে চাইলো কি কারণে হলে এসেছি। ঘুরতে আসার কথা বলে এড়িয়ে গেলাম। হলের ভেতরের দোকানটি এখনও খোলা। টুল বিছিয়ে কয়েকজন নেতা ও ক্যাডার আড্ডা দিচ্ছে। ঘড়ির কাঁটাতে তখন পৌনে একটা। যোগ দিলাম তাদের আড্ডায়। তারা সবাই কথা বলছে ঐদিনের রেইড নিয়ে। পাশেই বসে ছিল সূর্যসেন হলের নামকরা একজন ক্যাডার। কিছুদিন আগে পত্রিকায় তার ছবি এসেছিল। সেদিন সে সূর্যসেন হলেই ছিল। কিন্তু বিডিআর তাকে ধরেনি। কীভাবে বেঁচে গেলেন তিনি প্রশ্ন করলাম তাকে। 'প্রথমে আমাকে বিডিআর ধরেছিল। আমি তো বুঝে গিয়েছিলাম আজকে ধরা পড়লে খবর আছে। চেহারার মধ্যে খুব বিনয়ী ভাব নিয়ে বললাম, আমি সাধারণ ছাত্র। তাদের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ব্যস কাজ হয়ে গেল। আমাকে আর নিল না।' ক্যাডারের এই স্বীকারোক্তি শুনে আড্ডায় হাসির রোল পড়লো। বিডিআর যদি এই সময় রেইড দেয় তাহলে কী হবে? ভয় হলো, শেষ পর্যন্ত না ধরা পড়ি বিডিআর-এর কাছে। হলে অস্ত্র আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে হাসতে থাকে তারা। একজন বলে উঠলো না, 'না কোনো অস্ত্র নেই।' তাহলে কী নিয়ে হল পাহারা দিচ্ছেন প্রশ্ন করলে আরেকজন বলে, 'অস্ত্রের দরকার পড়ে না। আমাদের দেখলেই হলে কেউ ঢোকে না'। কথা বলতে বলতে আড়াইটা বেজে গেল। বিডিআরের কোনো দেখা নেই। ক্যাডাররা চলে গেল রুমে ঘুমাতে। বেরিয়ে এলাম হলের বাইরে। নীলক্ষেত বিশ্ববিদ্যালয় হলের গেটের পাহারাদারের কাছে জানতে চাইলাম বিডিআরের কাউকে রাস্তায় দেখেছে কিনা? রাত একটার দিকে পলাশীর দিকে যেতে দেখেছেন বলে তিনি জানালেন। পেট্রোল পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর খবর দিলেন ইস্কাটনে বিডিআরের রেইড হচ্ছে। রিকশা নিয়ে গেলাম ইস্কাটন। রাস্তায় ৭/৮ জন বিডিআর-এর সদস্য দাঁড়িয়ে। ৫৩ নং ওয়ার্ডের কমিশনারকে ধরতে তারা ১০৭ নম্বর বাসায় হানা দিয়েছে। তাদের একজন জানালো, তাদের রেইড এখন শেষ পর্যায়ে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে তল্লাশি অভিযান চালানো হবে না।

১৫ তারিখের মত বিডিআর আজকে বিশাল অভিযানে না নামলেও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্পটে বিডিআর রেইড দেয়। সূত্র মতে জানা যায়, ছয়জন সন্ত্রাসী ধরা পড়ে।